অনুবাদ সাহিত্যের ধারা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভারতের সংস্কৃত মহাকাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থগুলি থেকে বাঙালীর জন্য, বাঙালীর মত করে, বাংলায় যে গ্রন্থগুলি অনুবাদ করা হয়েছিল তাকে বলা হয় অনুবাদ কাব্য।

অনুবাদ কাব্য সৃষ্টির কারণ

প্রথমত,বহিরাগত আর্যদের সঙ্গে এদেশের আদি জনজাতি অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীনীয়দের সঙ্গে মিশে বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটেছিল। নতুন সৃষ্ট বাঙালীর সংস্কৃতির প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ। এই সময় এই জাতি নিজেদের উন্নতির জন্য ক্রমশ ভালর দিকে এগোতে চেয়েছে ভাষা থেকে কৃষ্টি সকল ক্ষেত্রে। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা সম্ভব হত না। আর তাই ঐতিহ্যগত সংস্কৃত সাহিত্যের ভালো উপাদানগুলি অনুবাদ করার প্রবণতা দেখা গেল। এবং সেগুলিই অনূদিত হতে লাগল যেগুলি বাঙালীর মনধর্মের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত,এসময়ে বাংলা ও বাঙালী ভারতের নবজাত সন্তান। ভারতের অন্যান্য জাতির মত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও বাংলা বৃহত্তর ভারত ভাবনার অন্তর্গত। সমগ্র ভারতের অখণ্ড জীবন ও দর্শনের বাইরে বাঙালীও ছিল না। আর আধ্যাত্মিকতাই যেহেতু ভারতের প্রধান মেরুদণ্ড তাই মহাভারত- রামায়ণ- ভাগবতের অনুবাদই হবে প্রথমে এটাই স্বাভাবিক। এই তিনটি গ্রন্থের সঙ্গে ভারতের যাবতীয় কৃষ্টির নাড়ির যোগ।

তৃতীয়ত,অনুবাদ সাহিত্যগুলি রচনা শুরু হয়েছিল তুর্কি- বিজয়ের প্রথম দুশ বছরের অরাজকতার অবসানে। চৈতন্য প্রভাব বিস্তারের আগেই এর সূচনা হয়েছিল। তুর্কি- বিজয়ের ফলে পরাভূত হিন্দুশক্তি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। ফলে অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আর অনভিজাত সংস্কৃতিকে কাছে টানার চেষ্টা করেছিল। এই মিশ্রণের ফলে নতুন বাঙালী জাতি গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। তাদের সামনে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের আদর্শটি তুলে ধরা জরুরী ছিল। এখানে হিন্দুত্বের বন্ধনসূত্র হয়ে রইল পুরাণাশ্রিত ভাবনা ও আদর্শবোধ। অতএব অনুবাদের প্রাথমিক আবেগে তার ঐতিহাসিক ভূমিকাই নিঃসন্দেহে প্রধান প্রেরণা।

চতুর্থত, অনুবাদ সাহিত্য রাজকীয় আনুকূল্য পেয়েছে সবচেয়ে বেশী। বরবক শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতি সুলতানরা তো বিখ্যাত হয়ে আছেন পৃষ্ঠপোষক হিসাবে। এই সকল শাসকরা এ রকম ধর্মীয় উদারতা ও সহনশীলতা দেখিয়েছিলেন বলেই অনুবাদ সাহিত্য রচনা অনেকাংশে সুবিধা হয়েছিল। অবশ্য সংস্কৃত কাব্যের গল্পগুলির টানই এদের মধ্যে প্রধান ছিল।

পঞ্চমত, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী- রস কবিদেরও মুগ্ধ করেছিল। জনসাধারণের মধ্যে এই গ্রন্থগুলির কাহিনীর সঙ্গে সামান্য পরিচয়ের পরে তাদের মধ্যেও তার বিস্তৃত পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা দেখা গিয়েছিল। কবিরা এই জনরুচির অনুবর্তী হয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন।

ষষ্ঠত, মনে রাখতে হবে এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটটিকে। অনুবাদগুলি রচনার আগে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলতে ক্ষুদ্র চর্যাপদ আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আখ্যান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফলে বড় কোনো আখ্যান রচনা বা চরিত্র নির্মিতির জন্য মহত্তর সাহিত্য ঐতিহ্যের কাছে শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন ছিল। আর এর মধ্য দিয়েই আদি অনুবাদকেরা পাঁচালীর রূপাদর্শটিকে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। নব্য রূপরীতির সূচনায় অন্য ভাষা থেকে আদর্শ গ্রহণের নিদর্শন সব দেশের সাহিত্যেই সুলভ।

সপ্তমত, উপরন্তু চৈতন্যের জন্মের পরে সারা বাংলা দেশে যে নতুন করে ভাবের বন্যা বয়ে গেল তার ফলে যে এক অভিজাত অনভিজাত সব একাকার হয়ে অখণ্ড বাঙালী জাতি গড়ে উঠেছিল তার ফলে বাঙালীর তৎকালীন ভাবের

অনুগ হয়ে ভাবুবাদও করা হয়েছিল প্রচুর। রামায়ণের মধ্যে বাঙালী তাই আজও খুঁজে পায় নিঃসংশয় বাঙালীয়ানা।

অনুবাদ কাব্যের বৈশিষ্ট্য

বাঙালী অনুবাদকেরা প্রধানত মহাভারত- রামায়ণ- ভাগবতের অনুবাদ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য পুরাণের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বিশেষ চোখে পড়ে না। এমনকি কালিদাসের মত কবির কাব্যও অনূদিত হয়নি। আসলে কাব্য সৌন্দর্য নয়, ধর্মীয় মাহাত্ম্যের ওপর ভর করে একটি জাতি নতুন করে নির্মিত হচ্ছিল। প্রথম যুগের অনুবাদে মূলানুগত্য লক্ষণীয়। মালাধর বা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অনুবাদ মূলের অনুসরণ। ব্যতিক্রম কৃত্তিবাস। চৈতন্যোত্তর যুগে ভাবানুবাদের প্রতি নজর দিয়েছেন কবিরা বেশী। অনুবাদে সংযোজন, পরিবর্তনের পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছে।

রামায়ণের অনুবাদ

চৈতন্যপূর্ব যুগ

কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ পাঁচালী

কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়ছে। কৃত্তিবাসের যে পুথিটিকে পণ্ডিতেরা মান্য বলে চিহ্নিত করেছেন তাতে প্রাপ্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায় –

এক, কৃত্তিবাসের চতুর্থ পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা কোনো এক বেদানুজ রাজার সভাসদ ছিলেন।

দুই, বঙ্গদেশে কোনো এক রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে সেই পূর্বপুরুষ বঙ্গদেশ ছেড়ে গাঙ্গেয় উপত্যকার ফুলিয়া নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

তিন, কবি যে দিনটিতে জন্ম নিয়েছিলেন সেটি ছিল মাঘমাসের সংক্রান্তি ও শ্রীপঞ্চমী তিথি এবং রবিবার।

চার, এগারো বছর পার হয়ে তিনি যখন বারো বছরে পড়লেন তখনই তিনি অধ্যয়নের জন্য উত্তর দেশে গেলেন।

পাঁচ, উত্তরদেশে অধ্যয়ন করতে যাওয়ার দিনিটি ছিল শুক্রবার। অর্থাৎ কবির দ্বাদশ বছরের জন্মদিনটি ছিল শুক্রবার।

ছয়, বিদ্যার্জনের পর কবি এক গৌড়েশ্বরের রাজসভায় গিয়ে মাঘমাসে রাজাকে সাতশ্লোক শুনিয়ে খুশি করেছিলেন।

প্রাপ্ত এই সব তথ্য থেকে ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় ঠিক করেছেন কৃত্তিবাসের জন্ম হয়েছিল ১৪৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী এবং ২০- ২২ বছরে তিনি যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলে তিনি হলেন রুকনুদ্দিন বরবক শাহ। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা অনেক বেশী যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করা হয়।

কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাল্মীকির রামায়ণের ভাবানুবাদ। অন্যান্য পুরাণগুলিও কবি পাঠ করেছিলেন। ফলে কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণের কাহিনীতে আনেক সংযোজন বিয়োজন করেছেন। কবি এই কাব্যকে বাঙালী জীবনের জাতীয় কাব্য হিসাবে গড়ে তুলেছেন। বাল্মীকির রামায়ণের প্রাচীন মহাকাব্যের ব্যাপ্তি, উচ্চমহনীয়তা, অমানুসিক বর্বরতা তাঁর কাব্যে নেই। তাই কৃত্তিবাসের রামায়োণের দুটি বৈশিষ্ট্য – অকৃত্রিম ভক্তিবাদ আর নিঃসংশয় বাঙালীয়ানা।

চৈতন্যত্তোর যুগের রামায়ণের অনুবাদ (রামায়ণের অন্যান্য কবিরা)

অদ্ভুত আচার্য

অদ্ভুত আচার্য সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। উত্তরবঙ্গে তাঁর কাব্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কবির রামায়ণ অদ্ভুত রামায়ণ নামে পরিচিত হলেও মূল সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে তাঁর কাব্যের বিশেষ সম্পর্ক নেই। মনে হয় তিনি রামায়ণের সাতকাণ্ডই অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর রচনারীতি বেশ সুখপাঠ্য। বাঙালী জীবনের সুখে- দুখে ভরা সাধারণ জীবনের মুহূর্তের চিত্রাঙ্কনে কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বর্ণনার রীতিতে তিনি কৃত্তিবাসকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা কৃত্তিবাসের থেকে কম ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও কিছু রামায়ণ অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়। এঁদের অনেকেই কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেছিলেন। দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ, ঘনশ্যাম দাস, ভবানী দাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, কৈলাস বসু, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কবিরা রামায়ণের কয়েকটি জনপ্রিয় কাহিনী অবলম্বন করে নিজেদের কিছু প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে মহিলা- কবি চন্দ্রাবতীর নাম এঁদের মধ্যে আলাদা করে উল্লেখযোগ্য। মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতী চিরকৌমার্য অবলম্বন করেন। লোককথা অবলম্বনে তিনি নাকি ছড়া- পাঁচালীর ঢঙে সংক্ষেপে রামায়ণের কাহিনী লিখেছিলেন।

মহাভারতের অনুবাদ

চৈতন্য-পূর্ব মহাভারতের অনুবাদ

মহাভারতের প্রথম অনুবাদক হিসাবে তিন জন কবির নাম পাওয়া যায় – কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয়। তবে পণ্ডিতরা অনেকেই মেনে নিয়েছেন যে কবীন্দ্র পরমেশ্বরই মহাভারতের আদি অনুবাদক। তুর্কি আক্রমণের পরে মুসলমানরা এদেশে শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পরে এদেশের ঐতিহ্যের পরিপোষক হয়ে উঠেছিলেন। এই সূত্রে বাংলা ভাষা- সাহিত্যের নতুন করে উঠে আসার ক্ষেত্রে অন্যতম পরিপোষক ছিলেন হুসেন শাহ। হুশেন শাহের লস্কর পরাগল খাঁয়ের নির্দেশে কবীন্দ্র মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। অতি সংক্ষেপে কবি এই অনুবাদ করেছিলেন।

বাংলা ভাষার পরবর্তী মহাভারত রচয়িতা শ্রীকর নন্দী। পরাগল খাঁয়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুঁটি খাঁর নির্দেশে ‘জৈমিনি মহাভারত’কে কেন্দ্র করে শ্রীকর কেবল মাত্র ‘অশ্বমেধ পর্ব’কে নিয়ে বিস্তৃত কাব্য রচনা করেন।

সঞ্জয় নামে আরও একজন কবির নাম পাওয়া যায়। পরমেশ্বরের সঙ্গে সঞ্জয়ের রচনার অনেক সাদৃশ্য থাকায় বা ভণিতা ব্যাবহারে কবির দ্বিধা থাকায় অনেকে মনে করেন ইনিই আলাদা কবি নন।

চৈতন্য-উত্তর মহাভারতের অনুবাদ

নিত্যানন্দ ঘোষ

এই কবি মহাভারতের অনুবাদক হিসাবে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কাশীরামের পূর্বের এই কবির কবি প্রতিভা ভালো না হলেও পরিমিত ক্ষেত্রে তিনি কুশলতার সঙ্গেই বিচরণ করেছিলেন।

কাশীরাম দাস

রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদক হিসাবে বাঙালীর মনে যে দুটি নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তাঁরা হলেন কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস। অনুমান করা হয় কবি কাশীরাম দাস ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমান জেলার সিংগি বা সিদ্ধি গ্রামে কবির জন্ম। বাবার নাম কমলাকান্ত। কবিরা তিন ভাই। কবির উপাধি ছিল দেব। চৈতন্যত্তোর কালের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী কবিরা ছিলেন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। কবি পুরো রামায়ণ অনুবাদ করার আগেই মারা যান। বাকি পর্বগুলো কবির পরিবারের কেউ অনুবাদ করেছেন বা অন্য কেউ অনুবাদ করে থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে কৃষ্ণানন্দ বসু নামে একজন কবির নাম পাওয়া যায়। মনে করা হয় শোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে কবি তাঁর 'ভারত পাঁচালী' রচনা শুরু করেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে কবির মূলানুগত্য লক্ষ্য করা যায়। মূল মহাভারতের অসংখ্য কাহিনী তিনি পরিবেশন করেছেন। কাহিনী প্রয়োজন মত সংক্ষিপ্ত বা সংযোজন করেছেন। তাঁর রচিত চরিত্রগুলি মহাকাব্য থেকে নেওয়া হলেও প্রাণপ্রকৃতিতে তারা বাঙালি হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব ভক্ত কবি এ কাব্যে বিষ্ণুভক্তির প্লাবন এনেছেন। এই কাব্য হয়ে উঠেছে চৈতন্য- পরবর্তীকালের বাঙালী জীবনের কাব্য।

এছাড়াও মহাভারতের কয়েকজন ছোটো অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় – রামচন্দ্র খান, কবি অনিরুদ্ধ, গঙ্গাদাস, দ্বৈপায়ন দাস, নিত্যানন্দ দাস, সারলাদাস, রাজেন্দ্র সেন প্রভৃতি।

ভাগবতের অনুবাদ (চৈতন্য-পূর্ব যুগে)

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'

আদি- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় অনুবাদগ্রন্থ মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। গ্রন্থে থাকা একটি কাল- পরিচায়ক শ্লোক থেকে জানা যায় কবির গ্রন্থটি রচনাকাল দুইজন পাঠান সুলতান বারবক শাহ (১৪৫৯- ১৪৭৪) এবং সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪- ১৪৮১)- এর রাজত্বকালে বিস্তৃত হয়েছিল। পুরো গ্রন্থে কবি গুণরাজ খন উপাধি ব্যবহার করেছেন। বিচারের দ্বারা ঠিক করা হয়েছে যে কবির উপাধিদাতা এই নবাব ছিলেন রুক্‌বুদ্দিন বারবক শাহ। কবির বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে। বাবার নাম ছিল ভগীরথ বসু, মায়ের নাম ইন্দুমতি বসু। কবির এই কাব্যের কোনো কোনো পুথি 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পাওয়া যায়। ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ করেছিলেন কবি এই কাব্যে।

ভাগবত হিন্দু- পৌরাণিক সংস্কৃতির এক শ্রেষ্ঠ ফসল। বৃহত্তর ভারতের বিবিধ বৈষ্ণব ধর্ম- দর্শনের পরিকল্পনার মূলে ভাগবতের প্রভাব অপরিসীম। চৈতন্য- পূর্ব যুগে কৃষ্ণলীলা আস্বাদনের দুটি পৃথক পদ্ধতি ছিল – ঐশ্বর্য ভাবনাময় ও মধুর রসাত্মক। মধুর রসাত্মক পদ্ধতিটি চৈতন্যের প্রভাবে সার্থকতার চরমে উঠে ছিল। উপরন্তু মনে রাখতে হবে তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী সময়ে যখন বাংলার সমাজে কিছুটা স্থিততা আসতে শুরু করেছিল তখন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেছিলেন মালাধর। কে বলতে পারে নতুনভাবে হিন্দুর সমাজকে গড়ার যে তাগিদ সে সময় হিন্দুর উচ্চবর্ণের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, একজন স্মার্ত পৌরাণিক নিষ্ঠাবান হিন্দু কবির কৃষ্ণের ঐশ্বর্য মহিমার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে যুগের সে তাগিদ মিশে গিয়াছিল কিনা – কবির সচেতন প্রয়াসে বা অসচেতন লেখনীতে। অন্যদিকে মনে রাখতে হবে চৈতন্যের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল যে সমাজে সে সমাজের অন্তরে চৈতন্যের আবির্ভাবের শক্তিও সঞ্চিত হয়েছিল, একথা আগেই বলা হয়েছে। মালাধরের কাব্যেও তার আভাস দেখা গিয়েছিল। সেকারণেই ঐশ্বর্য ভাবমূলক একটি কাব্যের মধ্যে থেকে 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' শ্লোকাংশটিকে চৈতন্যদেব ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কারণ এই প্রেমময় কৃষ্ণসাধনা চৈতন্যের মধ্য দিয়েই অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

চৈতন্য-উত্তর ভাগবতের অনুবাদ

চৈতন্য যে প্রেমময় কৃষ্ণ আরাধনার নতুন পথের সন্ধান দিলেন তার ফলে তাঁর পরবর্তীকালে ভাগবতের অনুবাদের নামে মধুরলীলাঘন কৃষ্ণলীলা কাব্য রচনায় উৎসাহী হল কবিরা। যশরাজ খান (কৃষ্ণমঙ্গল), গোবিন্দ আচার্য ও পরমানন্দ গুপ্ত, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য (কৃষ্ণপ্রেম- তরঙ্গিণী), দ্বিজমাধব (শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল), দুঃখী শ্যামদাস (গোবিন্দমঙ্গল), কৃষ্ণদাস (মাধবচরিত), কবিশেখর (দৈবকীনন্দন), অভিরাম দাস (শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল), দ্বিজ পরশুরাম (কৃষ্ণমঙ্গল), শঙ্কর চক্রবর্তী (ভাগবতামৃত) ইত্যাদি অনেকের দ্বারা অনুবাদ রচিত হয়েছিল।